একটা যেন...

বোমাবাহী রকেটটা একটা দলছুট অস্ত্র ছিল। একেবারে শেষের দিকে উৎক্ষেপণ করা গুটিকয়েক অস্ত্রের একখানা। ঠিক কোন জায়গাকে নিশানা করে তাকে পাঠানো হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না। তবে নিঃসন্দেহে সেটা লন্ডন নয়। কারণ ততদিনে সামরিক লক্ষ্যবস্তু হিসেবে লন্ডনের কোনো গুরুত্ব অবশিষ্ট নেই। আসলে তখন লন্ডন বলতেই আর কোনো কিছু বেঁচে নেই। বহুকাল আগেই, এ জাতের কাজকর্মের হিসেব করাটা যাদের কাজ, তারা হিসেব করে বলে দিয়েছিল, অত ছোটো একটা জায়গাকে মুছে দেবার জন্য তিনটে হাইড্রোজেন বোমাই যথেষ্ট। অতিরিক্ত উৎসাহে, তিনটের জায়গায় কুড়িটা হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল শহরটার উপরে।

তবে এই বোমাটা সেই বিশ বোমার একজন ছিল না। কোথা থেকে তার উড়ান শুরু, আর কোন লক্ষ্যেই বা বাতাসে ভেসেছিল, সে তা জানা যায় না। উত্তর মেরুর নির্জন বরফের উপর দিয়ে উড়ে এসেছিল কি সে? নাকি আটলান্টিকের জল পেরিয়ে? কেউ সে উত্তর জানে না। ইদানীং সেসব নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না আর।

তবে হ্যাঁ, এককালে ভাবত বই-কি। এই বিষয়গুলোয় গভীর পাণ্ডিত্য আছে এমন মানুষ কম ছিল না তখন। বহু দূরে বসে তারা ধেয়ে-আসা অতিকায় উড়ন্ত অস্ত্রদের দিকে সতর্ক নজর রাখত, তাদের ধ্বংস করবার জন্য নিজেরাও ভাসিয়ে দিত আরেকদল ক্ষেপণাস্ত্র। কখনো-কখনো, অন্ধকার ঊর্ধ্বাকাশে চাঁদ-সূর্যের রাজত্বে মুখোমুখি দেখাও হয়ে যেত দু-তরফের ক্ষেপণাস্ত্রদের। তখন অসীম সেই অন্ধকারের বুকে ক্ষণিকের জন্য চোখধাঁধানো আলোর ফুল ফুটে উঠত। সে আলো গভীর মহাকাশে ধেয়ে যেত পৃথিবীর বার্তাবহ হয়ে। হয়তো অনাগত শতাব্দীগুলোতে সুদূরের কোনো অ-মানুষী চোখ তাদের দেখবে, সযত্নে পড়ে নেবে তাদের বার্তাদের।

তবে সেসব কিছুকাল আগের কথা। যুদ্ধ তখন সবে শুরু হয়েছে। তারপর আক্রান্তরা যা ভেবেছিল, সেটাই ঘটে যায়—অক্লেশে তাদের প্রতিরোধকে মুছে দেয় আক্রমণকারীরা।

কিন্তু প্রতিরোধ মুছে গেলেও, নিজেদের কর্তব্যটুকু সম্পূর্ণ করবার জন্য প্রাণটাকে আঁকড়ে রেখেছিল আক্রান্তরা। তাদের শুরুতেই শেষ করে না-দেওয়াটা আক্রমণকারীদের তরফে একটা ভীষণ ভুল ছিল। সে ভুল আক্রমণকারীরা যখন বুঝতে পারল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

নাঃ। আর কোনো নতুন ক্ষেপণাস্ত্র উড়বে না এবার। কেবল, সম্মিলিত ধ্বংসের খানিক আগে গোপন লক্ষ্যদের নিশানা করে যে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ছোড়া হয়েছিল, তারা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে আবহমণ্ডল ছেড়ে মহাকাশে ধেয়ে গেছে, আর এখন সেগুলো একে একে ফের ঢুকে আসছে আবহমণ্ডলে। যন্ত্রমস্তিষ্কে বিস্ফোরণের আদেশের জন্য বৃথা অপেক্ষা করতে করতেই নিষ্ক্রিয় অস্ত্রগুলো ঝরে পড়ছে পৃথিবী জুড়ে এখানে-ওখানে।

এখানে নদীটা তার দু-কূল উপচে ডাঙায় উঠে এসেছে। তার ভাটার দিকে কোথাও কোনো বিস্ফোরণের ধাক্কায় জমি পেঁচিয়ে উঠে বন্ধ করে দিয়েছে তার সাগরমুখী যাত্রাকে।

আর্থার সি ক্লার্ক
গল্পসমগ্র ১

সম্পাদনা
দীপ ঘোষ

অনুবাদ
দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, সুমিত বর্ধন, ঋজু গাঙ্গুলী,
রুদ্র দেব বর্মন, কৌশিক মজুমদার, রনিন,
সোহম গুহ, সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়, দীপ ঘোষ

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনের শুরুর দিন থেকেই আমাদের ইচ্ছা ছিল পাশ্চাত্য সায়েন্স ফিকশনের যে সমস্ত দিকপাল লেখকেরা তাঁদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন, সেই গল্পগুলিকে বাংলায় নিয়ে আসার। এর আগে বাংলায় অনুবাদ মূলত জুল ভের্ন ও এইচ জি ওয়েলসের মধ্যে সীমিত ছিল প্রায় এক শতক। কল্পবিজ্ঞান পত্রিকাগুলিতে বেশ কিছু অনুবাদ হলেও সেগুলি খুব কমই গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশের মুখ দেখেছে। মূলত কপিরাইট সংক্রান্ত অনুমতির জটিলতার জন্যে বাংলায় এই প্রচেষ্টা খুব একটা হয়নি। সাফল্যের সঙ্গে রে ব্র্যাডবেরির তিনটি প্রখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদস্বত্ব গ্রহণ ও তাদের অনুবাদ প্রকাশের পরে আমরা হাত দিয়েছিলাম আর্থার সি ক্লার্কের ছোটোগল্পে। ক্লার্ক প্রথম ছোটোগল্প লেখা শুরু করেন ১৯৩৭ সালে (ট্রাভেল বাই ওয়্যার), আর তাঁর লেখা শেষ ছোটোগল্প 'ইম্প্রুভিং দ্য নেইবারহুড' ছাপা হয় ১৯৯৯ সালে। এই দীর্ঘ ৬২ বছরে তিনি লিখেছেন ১০০টিরও বেশি ছোটোগল্প। এই সমস্ত গল্পগুলিকে কালানুক্রমে সাজিয়ে তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা আমাদের। গল্পগুলির সঙ্গে রইল প্রথম প্রকাশ ও প্রথম গ্রন্থভুক্ত হওয়ার তথ্যও। অনেক সময় ক্লার্ক বা তাঁর গ্রন্থপঞ্জিকার গল্পের শুরুতে সেই বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য জানিয়েছেন, আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি সেই কথাগুলিও। প্রথম খণ্ডে রইল ১৯৫১ সালের 'হলিডে অন দা মুন' পর্যন্ত লেখা ছোটোগল্প। অনিবার্য কারণে 'গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল' গল্পটি এই সংকলন থেকে বাদ দিতে হয়েছে, যা পাওয়া যাবে দ্বিতীয় খণ্ডে। এটি বাদ দিয়ে আটাশটি গল্প কালানুক্রমে প্রথম খণ্ডে গ্রন্থভুক্ত করা হল।

আর্থার সি ক্লার্ক পাশ্চাত্য সায়েন্স ফিকশনের দুনিয়ায় প্রথম তিনজন শক্তিশালী লেখকদের একজন হিসাবে পরিগণিত হন। এই বইটিতে তাঁর গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন বাংলার অন্যতম লেখক ও অনুবাদকেরা। আশা করা যায় তাঁর নানা স্বাদের সায়েন্স ফিকশনের অনুবাদগুলি বাংলার পাঠকদেরও মন জয় করে নেবে।

প্রকাশক

জানুয়ারি, ২০২৪

সূচিপত্র

ট্র্যাভেল বাই ওয়্যার	১১
হাউ উই ওয়েন্ট টু মার্স	১৬
রিট্রিট ফ্রম আর্থ	২৭
রিভারি	৩৮
দি অ্যাওয়েকেনিং	৪১
ওয়্যাকি	৪৫
লুপহোলস	৪৭
দ্য রেসকিউ পার্টি	৫৫
টেকনিক্যাল এরর	৬৯
কাস্টঅ্যাওয়ে	৮৬
দ্য ফায়ার উইদিন	৯৩
ইনহেরিটেন্স	১০২
নাইটফল	১১১
হিস্ট্রি লেসন	১১৫
ট্রানজিয়েন্স	১২৪
দ্য ওয়াল অব ডার্কনেস	১৩১
দ্য লায়ন অব কোমার	১৫২
দ্য ফরগটেন এনিমি	১৯৯
হাইড অ্যান্ড সিক	২০৭
ব্রেকিং স্ট্রেন	২১৭
নেমেসিস	২৫৬
টাইম'স অ্যারো	২৭১
এ ওয়াক ইন দ্য ডার্ক	২৯০
সাইলেন্স প্লিজ	৩০০
ট্রাবল উইথ দ্য নেটিভস	৩১০
দ্য রোড টু দ্য সি	৩২২
দ্য সেন্টিনেল	৩৭৮
হলিডে অন দ্য মুন	৩৮৯

ট্র্যাভেল বাই ওয়্যার

(বেতার যাতায়াত)

প্রথম প্রকাশ: 'আমেরিকান সায়েন্স ফিকশন স্টোরিজ', ডিসেম্বর ১৯৩৭
সংকলিত, 'দ্য বেস্ট অব আর্থার সি ক্লার্ক ১৯৩৭-৫৫'।

কল্পবিজ্ঞান সর্বদা বিপুল সংখ্যায় অ্যামেচার লেখাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছে। আক্ষরিক অর্থেই উৎসাহী ফ্যানেরা হাজারে হাজারে বের করেছে নকল (কখনও ছাপা) ম্যাগাজিন। [...] প্রথমদিকের যেসব লেখা আমি আদৌ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলাম, সেসব প্রকাশিত হয়েছিল এই ধরনের কিছু ম্যাগাজিনেই। [...] এগুলো অন্য কিছু করুক আর না করুক, অন্তত পরম শূন্যাঙ্কের কাজ করে, যার নিরিখে আমার পরের লেখাগুলোর ক্রমানুপাত নির্ধারণ করা যেতে পারে। 'ট্র্যাভেল বাই ওয়্যার' আমার প্রথম প্রকাশিত গল্প।

আপনাদের মশাই কোনো ধারণাই নেই, রেডিয়ো যাতায়াতব্যবস্থাটাকে নিখুঁত করতে আমাদের কী ঝঞ্ঝাট-ঝামেলাই না পোয়াতে হয়েছে। আর তাতেও বলতে পারি না যে ব্যাপারটা এখনও একেবারে নিখুঁত হয়েছে। ঝাপসা ভাবটাকে দূর করা ছিল সব চাইতে কষ্টের কাজ। বছর তিরিশেক আগে টেলিভিশনের বেলাতে ঠিক যেমন করতে হয়েছিল। এই ছোট্ট সমস্যাটার পিছনেই আমাদের লেগে গিয়েছিল প্রায় বছর পাঁচেক। বিজ্ঞান জাদুঘরে দেখে থাকবেন নিশ্চয়ই, প্রথমেই আমরা যেটা পাঠিয়েছিলাম, সেটা একটা কাঠের চৌকো টুকরো। এর অংশগুলো সব ঠিকঠাক একত্রে জোড়া লেগে গিয়েছিল বটে, কিন্তু পুরো একটিমাত্র শক্তপোক্ত চৌকো টুকরোর বদলে তার আদল এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেন লক্ষ লক্ষ কুঁচো দিয়ে গড়া। ঠিক যেন আদি যুগের টেলিভিশনের ছবির একত্রিমাত্রিক সংস্করণ। এর একটা কারণ ছিল। বস্তুটার উপর কাজ করা উচিত ছিল পরমাণু ধরে ধরে। তার চাইতেও ভালো হত ইলেকট্রন ধরে ধরে কাজ করলে। সে জায়গায় আমাদের স্ক্যানার কাজ করেছিল এক-একবারে ছোটো ছোটো এক-একটা খামচা দিয়ে।

কিছু কিছু জিনিসে এতে অবশ্য কিছু যেত-আসত না; কিন্তু দেখলাম, মানুষের কথা তো ছেড়েই দিন, শিল্পকলা পাঠাতে গেলেও পদ্ধতিটাকে আরও উন্নত করা জরুরি। সেটা

সমাধা করলাম আমাদের কাজের জিনিসটাকে চারপাশ থেকে ডেল্টা রশ্মি স্ক্যানার দিয়ে ঘিরে ফেলে। উপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে আর পিছনে। এই ছখানাকে একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মেলানো, কী বলব আপনাদের, সে একেবারে খেল দেখিয়ে ছেড়েছিল। তবে কাজটা হয়ে যেতে দেখলাম যে আমাদের পাঠানো জিনিসগুলো অতি আণুবীক্ষণিক বস্তুর চাইতেও ছোটো আকারে ট্রান্সমিট হচ্ছে। বুঝলাম বেশির ভাগ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই এটাই যথেষ্ট।

তারপর ৩৭ তলার বায়োলজির লোকজনদের এড়িয়ে, তাদের থেকে একটা গিনিপিগ ধার করে নিয়ে এলাম। তারপর দিলাম চালিয়ে যন্ত্রটার ভিতর দিয়ে। সেটা একদম দুর্দান্ত অবস্থাতেই চলে এল, তবে অক্কা পেয়ে, এইটুকুই যা। আমাদের তাই ওটাকে ওটার মালিকদের ফেরত দিয়ে আসতে হল, সঙ্গে পোস্টমর্টেম করার একটা বিনীত অনুরোধ সমেত। তারা তো প্রথমে খানিকটা হাউমাউ জুড়ে দিল। তাদের মাসখানেকের কষ্টে বোতলে লালনপালন করা কোনো জীবাণুর একমাত্র নমুনাটি দিয়ে বেচারা জীবটাকে তারা টিকে দিয়ে রেখেছিল। এতই তারা তখন খাপ্পা যে সোজা মুখের উপর না করে দিল।

সামান্য বায়োলজিস্টদের এমন অবাধ্যতা বড়োই নিন্দাজনক, তাই তৎক্ষণাৎ তাদের ল্যাবরেটরিতে একটা চড়া ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্র সৃষ্টি করে আমরা দিলাম সবার মিনিটকয়েকের জন্যে জ্বর বাধিয়ে। আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে এল পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, রায় তার যে জীবটার অবস্থায় কোনো খামতি নেই, কেবল পটোল তুলেছে শক পেয়ে। সঙ্গে বাড়তি উপদেশ যে ফের যদি আমরা ওই এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই, তাহলে যেন আমাদের শিকারের চোখ বেঁধে দিই। সঙ্গে আমাদের এ-ও জানিয়ে দেওয়া হল যে গারাজে যাদের গাড়ি ধোয়ার কথা, সেইসব চুরির বাতিকে ভোগা মেকানিকের লুটপাটের হাত থেকে বাঁচতে ৩৭ তলায় একটা কম্বিনেশন লক বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা তো আমরা আর মেনে নিতে পারি না, তাই সঙ্গে সঙ্গে ওদের তালাটার এক্সরে করে ফেললাম, আর চাবি খোলার শব্দবন্ধটা ওদের বলে দিয়ে দিলাম একেবারে ঘাবড়ে।

আমাদের লাইনে এটাই সব চাইতে ভালো, সবার সঙ্গে যা খুশি তা-ই করা যায়। আমাদের সমান সমান প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে ছিল কেবল উপরতলার কেমিস্টরা, তবু বেশির ভাগ সময়ে বাজি আমরাই মারতাম। হ্যাঁ, মনে আছে, একবার ছাদের ফুটো দিয়ে চুপিচুপি ওরা আমাদের ল্যাবে জঘন্য একটা কিছু জৈব পদার্থ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। মাসখানেক আমাদের রেসপিরেটর লাগিয়ে কাজ করতে হয়েছিল বটে, কিন্তু শোধ আমরা পরে ঠিকই তুলেছিলাম। রোজ রাতে স্টাফেরা চলে যাবার পরে ল্যাবে মহাজাগতিক রশ্মির হালকা ডোজ পাঠিয়ে দিয়ে ওদের সুন্দর সব থিতোনো দ্রবণের বারোটা বাজিয়ে দিতাম। অবশেষে এক সন্ধেবেলা ল্যাবে থেকে-যাওয়া বুড়ো প্রফেসার হাডসন মরো-মরো হয়ে পড়লে ব্যাপারটাতে রাশ টানতে হয়। যাক গে, ফিরে আসি গল্পে—

আমরা আর-একটা গিনিপিগ জোগাড় করলাম, সেটাকে ক্লোরোফর্ম করলাম, তারপর দিলাম ট্রান্সমিটারের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে। আমাদের পুলকিত করে ফের বেঁচে উঠল সেটা।

হাউ উই ওয়েন্ট টু মার্স

(আমাদের মঙ্গলযাত্রা)

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে ডগলাস ডব্লিউ এফ মেয়ার সম্পাদিত 'অ্যামেচার সায়েন্স ফিকশন স্টোরিজ' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

বিঃ দ্রঃ—এই কাহিনির সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক এবং লেখকের অবচেতনের বাসিন্দা। সাইকোঅ্যানালিস্টদের দ্বারা এই গল্পে কোনো উদ্দেশ্য সাধন হবে না।

১৯৫২ সালের শীতকালে আমাদের 'খড়ভূপে নাসিকাগর্জক রকেট সংঘ'র সদস্যদের অবিশ্বাস্য অভিযানের এই কাহিনি আমি যথেষ্ট ভয়ে ভয়েই লিখতে বসেছি। হয়তো সময়কেই আমাদের এই অভিযানের শেষ বিচারক হিসেবে মেনে নেওয়াটা ভালো হত, কিন্তু আমাদের সংঘ—যার সভাপতি, সেক্রেটারি ও কোশাধ্যক্ষ আমি নিজেই—তার মাননীয় সদস্যরা অন্যমত পোষণ করেন। তাঁদের দাবি, এ অভিযান নিয়ে আমাদের নামে যে অভিযোগ—কেবল অভিযোগই বা বলি কেন, যে নিন্দাবাদ উঠেছে, আমাদের চরিত্র, যুক্তিবুদ্ধি, এমনকি আমাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা—এই সমস্ত কিছু নিয়েই যে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন, আমাদের নিন্দুকরা তার বিরুদ্ধে নিশ্চুপ থাকাটা অন্যায় হবে।

এইখানে, আমাদের সাফল্য নিয়ে 'ডেইলি ডুল' পত্রিকায় প্রফেসার সুইভেল কিংবা 'উইকলি ওয়াশ আউট' পত্রিকায় ড. স্পোকেট যেসব অস্বাভাবিক উক্তি করেছেন, তার জবাব দেওয়াটাও সমীচীন হত হয়তো, কিন্তু স্থানাভাবে আমরা সে জবাব এইখানে দেবার থেকে বিরত থাকছি। একটাই আশা, এই 'পণ্ডিত'দের ধোঁয়াশামার্কা কথাবার্তা কোনো বুদ্ধিমান মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

১৯৪১ সালের 'রাজা বনাম ব্রিটিশ রকেট সোসাইটি' মামলা এবং তার পরবর্তী আরও উত্তেজক 'ব্রিটিশ রকেট সোসাইটি বনাম রাজা' মামলার ফলে রকেটবিজ্ঞান নিয়ে জনসমাজে যে বিপুল সচেতনতা গড়ে উঠেছিল, সে বিষয়ে আপনাদের অনেকেই অবগত আছেন।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে সফল উড়ানের শেষে পার্লামেন্ট হাউসে অ্যাডমিরাল সার হোরাশিও ফফোর্থ ফক্রেনজি এমপি, কেসিবি, এইচপি, ডিটি-র মাথায় একটি পাঁচ টনের রকেট

অবতরণ করবার ফলস্বরূপ এদের মধ্যে প্রথম মামলাটির সূত্রপাত ঘটে। তবে সৌভাগ্যবশত, তার আগেই চড়া দামে চাঁদে জমি বিক্রয় করবার ফলস্বরূপ ব্রিটিশ রকেট সোসাইটি এই মামলায় প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার হ্যাট্রিক প্যাস্টিং, কেসি-কে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিল। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় মামলাটিতে কোনো পক্ষেরই জয়-পরাজয় ঘটেনি।

তবে দ্বিতীয় মামলায়, ১৯৪০ সনের রকেটচালন আইনে এই বিষয়ক যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রকেট সোসাইটির অ্যাপিলটিতে সোসাইটির বিজয় ঘটেছিল—এটি ধরে নেওয়া যায়। শুনানি চলাকালীন প্রদর্শনের জন্য আদালতে আনা একটি রকেটের মডেলের বিস্ফোরণে প্রায় সমস্ত বিরুদ্ধ পক্ষ ও বিচারক ইত্যাদিদের একটা বড়ো অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই তার মূল কারণ ছিল। সম্প্রতি সেই ধ্বংসস্তূপে খননকার্য চালিয়ে জানা গেছে, কোনো রহস্যময় সমাপতনের ফলে এই দুর্ঘটনার সময় সোসাইটির কোনো সদস্যই আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। এ ছাড়াও দুর্ঘটনায় দৈববশে রক্ষা পেয়ে-যাওয়া দুই সাক্ষীর বয়ান মোতাবেক, বিস্ফোরণের সামান্য আগে সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হেক্টর হেপটেন প্রদর্শনীর জন্য আনা রকেটটির খুব কাছে কয়েক মুহূর্তের জন্য উপস্থিত হয়েই দ্রুতবেগে আদালতকক্ষ পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যতদিনে কমিটি কাজ শুরু করে, ততদিনে হেপটেন রাশিয়ায় চলে গিয়েছেন। তাঁর নিজের বয়ানে এই রাশিয়াগমনের উদ্দেশ্য ছিল, 'পুঁজিবাদী সমাজের বিরোধিতার আওতার বাইরে নির্বিবাদে এমন এক জমিতে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া, যেখানে শ্রমিক ও বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের কৃতজ্ঞ কমরেডদের কাছে পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার পান।' তবে এগুলি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক কথা।

১৯৪০-এর আইনটি বাতিল হবার পর, এবং 'সারে' অঞ্চলে একটি বিরাট রকেট আবিষ্কৃত হবার পর এই বিষয়ে গবেষণা ফের পালে হাওয়া ফিরে পায়। রকেটের গায়ে 'ইউএসএসআর-এর সম্পত্তি। কৃপাপূর্বক মস্কোয় ফেরত পাঠাইবেন'—এই লেবেল লাগানো থাকায় সে সময় সকলেই অনুমান করেছিল রকেটটি দেশত্যাগী হেপটেনের অবদান। মস্কো থেকে সারে অবধি একটা রকেটের উড়ে আসা নিয়ে তখন বেশ উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। তবে এর বেশ কিছুকাল বাদে প্রমাণিত হয়, প্রচারসর্বস্ব 'হিকলবরো রকেট সংঘ'র লোকজন এই রকেটটিকে একটি এরোপ্লেনের সহায়তায় আকাশ থেকে 'সারে'র মাটিতে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল।

এরপর ১৯৪৫ সাল নাগাদ দেখা গেল, দেশে অগুনতি রকেট সঙ্ঘের উদ্ভব ঘটেছে। তাদের পরীক্ষানিরীক্ষার ধ্বংসলীলা বিপুল এলাকা জুড়ে ক্রমশই বেড়ে উঠছিল। আমার রকেট সংঘ এর অনেক পরে, অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও অল্পকালের মধ্যেই একটি চার্চ, দুটি মেথডিস্ট চ্যাপেল, পাঁচটি সিনেমা হল, সতেরোটি ট্রাস্ট হাউস এবং অসংখ্য বসতবাটী তার শিকার হয়েছিল। এমনকি সুদূর উইভিল ইন দা উর্জল কিংবা লিট্‌ল ডিথারিং অবধি এই ধ্বংস সাধনের কৃতিত্ব ছড়িয়েছিল আমাদের সংঘ।

রিট্রিট ফ্রম আর্থ

(উইপোকা)

প্রথম প্রকাশ: 'অ্যামেচার সায়েন্স ফিকশন স্টোরিজ', মার্চ ১৯৩৮
পরবর্তীকালে 'দ্য বেস্ট অব আর্থার সি ক্লার্ক' সংকলনে গ্রন্থিত।

আমার এখন সন্দেহ হয়, আমার এই বিস্ময়কর জন্তুগুলোর প্রতি আগ্রহ জন্মানোর পিছনে অ্যাস্টাউন্ডিং স্টোরিজের জুন ১৯৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত পল আরন্সটের দ্য রেড অব দ্য টারমাইটস দায়ী।

মানুষ যখন ভবিষ্যতের স্বপ্ন, সেই কয়েক কোটি বছর আগে আফ্রিকার উপরে জমে-থাকা বুকভরা মেঘ ভেদ করে নেমেছিল এক যান। তার আগে যদিও এখানে নেমেছিল আরও দুইটি নভোযান। সেই তৃতীয় যানের, দীর্ঘ অন্ধকার জমা মহাবিশ্ব ভ্রমণের শেষে ক্লান্ত, রিক্ত যাত্রীরা চোখ মেলে দেখেছিল এক প্রাণোচ্ছল গ্রহ। তারা জানত না, এই গ্রহে তারা প্রথম অনাহূত আগন্তুক নয়। মানুষের আবির্ভাবের সহস্র লক্ষাধিক বছর আগে সেই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল এক গতযৌবনা সভ্যতার শেষ কিছু সদস্য। উভয় সভ্যতাই 'সভ্য' হওয়ায় মানুষদের মতো তারা অস্ত্র আর মৃত্যুর দামামা বাজায়নি। মেনে নিয়েছিল একে অপরের উপস্থিতিকে। বসুন্ধরার সেই প্রাগৈতিহাসিক অধীশ্বরদের সাম্রাজ্য প্রসারিত ছিল প্লুটোর এলোমেলো কক্ষপথ অবধি, তাদের সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যদ্‌দর্শনের মতো। তারা জানত, মানুষের আগমন হবে, তাদের জন্য এই গ্রহকে তৈরি করে দিতে হবে।

সেই পুরাতনদের সভ্যতার শেষ প্রদীপটি নিবে যাওয়ার চার কোটি বছর পরে তাদের ধুলোয় মেশানো সাম্রাজ্যের স্থানে মানুষ খাড়া করল তার আকাশচুম্বী অট্টালিকাদের, জানতেও পারল না তাদের অট্টালিকার সঙ্গে এককালে মেঘকে স্পর্শ করত অতিকায় ইমারত।

কিন্তু প্রাচীন বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। সেই পুরাতনদের কাছ থেকে থাকার অধিকার পাওয়া সেই গ্রহান্তরের জীবেরা কখন নিজেদের অজান্তেই হয়ে উঠেছে এই নীল গ্রহের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ক্রান্তীয় স্থলভাগের অস্থানে-কুস্থানে সেই জীবদের অন্ধ সেবকদের তৈরি

ঘরবাড়ি মানুষের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছে ক্ষেত্রবিশেষে, ধ্বংস করেছে তার বই, আসবাবপত্র। কিন্তু নয়টা-পাঁচটার জাঁতাকলে আটকে-পড়া মানুষেরা জানতে পারেনি, এই প্রাচীন জীবেরা একদিন আবার তারাদের মাঝে নিজেদের অতীতকে খুঁজতে বেরোবে। জানার কথা না। এই সাম্রাজ্য অন্ধকারের, অগুনতি অন্ধ বিবর্ণ দাসের পরিশ্রমের ফসল। দূর থেকে দেখলে ঢিপি বলে ভ্রম হয়।

***

"ভদ্রমহোদয়গণ," সভাপতি গম্ভীর স্বরে মেপে মেপে বললেন, "আপনাদের এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে তৃতীয় গ্রহ যত তাড়াতাড়ি আমরা দখল করব ভেবেছিলাম, তত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে না। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের স্লিপার এজেন্টরা বহু বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদের বীজ বপন করছে মানুষের অজান্তে। আমরা জানতাম, আমাদের আগ্রাসন হবে অপ্রতিরোধ্য। মানুষ তার উৎকর্ষের প্রথম ধাপও অতিক্রম করেনি; তার অস্ত্রসম্ভার হাস্যাস্পদ। তারা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ-যুদ্ধ খ্যালে ধর্ম আর জাতীয়তাবাদের নামে। এই দ্বিপদগুলোর সংহতির অভাব আমাদেরকে সাহায্যই করবে জানতাম।

"কিন্তু সাবধানের মার নেই। যাবতীয় প্রতিরোধকে মূলেই বিনাশ করার জন্য আমরা এই গ্রহের প্রত্যেক প্রান্তে আমাদের গুপ্তচরদের নিয়োগ করেছি। তারা মানুষের সমাজে মিশে আছে, অপেক্ষা করছে প্রত্যেকটি বড়ো বড়ো শহরে। তারা তাদের কাজে খুবই দক্ষ, না হলে আজ এই কথাগুলো বলার সুযোগই হত না। কিন্তু আমরা জানতাম, পৃথিবীর জল-স্থল-আকাশে আর কোনো রহস্য অজ্ঞাত নয় আমাদের। আমরা... আমি ভুল জানতাম।

"ইংল্যান্ড নামে উত্তরে যে জলে ঘেরা ভূভাগ আছে, সেখানে আমাদের প্রধান গুপ্তচর হল মহান ভঅরাকের পৌত্র সেরভ্যাক থেটন। সে ইংরেজদের আদবকায়দা রপ্ত করে—অবশ্য ইংরেজদের থেকে রপ্ত করার আছেই বা কী—ওদের সমাজের কেউকেটাদের একজন হয়ে উঠেছে। ইংরেজদের বিশ্ববিদ্যালয় নামের এক ভাঁওতাবাজির প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন ছাত্র হয়েও কাটিয়েছে থেটন। তারপর ছেড়ে দিয়েছে তিতিবিরক্ত হয়ে। মানুষের শিক্ষাদীক্ষার নামে যা আছে তা হল প্রহসন।

"ভদ্রমহোদয়েরা, মনে রাখবেন থেটন বয়সে নবীন, তার আগ্রহের ব্যাপ্তিও তাই বিশাল। ওর রিপোর্টে তাই ওই বিচিত্র জন্তুগুলোর বিবরণ দেখে বিব্রত হবেন না। আমি বলব থেটনের এই গ্রহের জীববৈচিত্র্যের উপরে, তদুপরি তাদেরকে শিকার করে শেষ করার আগ্রহ না জন্মালে আমাদের একমাত্র শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা জানতেও পারতাম না। হ্যাঁ, শত্রু।" সভাপতি একটা বোতামে আলতো করে টিপলেন। "বাকিটা আপনার ওর কাছ থেকেই শোনা জরুরি।"

সভার সদস্যদের মধ্যে থেকে সেরভ্যাক থেটনের গমগমে গলা ভেসে এল। যে গলা থেটনকে বানিয়েছে সুবক্তা, আলাদা করেছে মঙ্গলের এই আর্য মহাসভার বাকিদের থেকে।

নাইটফল

প্রথম প্রকাশ: 'কিংস কলেজ রিভিউ', ১৯৪৭
'রিচ ফর টুমরো' গল্পসংগ্রহে 'দ্য কার্স' নামে সংকলিত হয়।

'নাইটফল' বা 'দ্য কার্স' গল্পটি লিখেছিলাম একবার শেকসপিয়রের সমাধিস্থল দেখে এসে। সে সময় আমি স্ট্র্যাটফোর্ড আপন অ্যাভন-এর কাছাকাছি এক জায়গায় রয়াল এয়ার ফোর্সের শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করছি। মাত্রই এক দশক আগেও যাকে কল্পবিজ্ঞান বলা যেত স্বচ্ছন্দে, তেমনই একটা পরিবেশে আমার কাজকর্ম। এহেন একটা সংযোগ এ গল্পকে একটা অন্য মাত্রা দিয়েছে।

তিন শতাব্দী ধরে শহরটা এইখানে একটা নদীর বাঁকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকেছে আর তার খ্যাতি ছড়িয়ে গিয়েছে দুনিয়াভর। সময় আর বদল দুইই তাকে ভারী মৃদুভাবেই স্পর্শ করেছে মাত্র। আর্মাডার হানাদারি কিংবা তৃতীয় রাইখ-এর পতনের খবর সে জেনেছে দূর থেকেই। মানুষের সমস্ত যুদ্ধ তার পাশ কাটিয়ে বয়ে গেছে।

আর এখন, শহরটা আর নেই। জায়গাটা দেখে কারও মনেও হবে না, এখানে সে শহর ছিল কখনও। বহু শতাব্দীর কত শ্রম, কত সম্পদ... সব একটা মুহূর্তে ধুয়ে-মুছে গেছে তার। পুড়ে শক্ত হয়ে-যাওয়া মাটির বুকে তার রাস্তাদের আবছা ছাপটুকু চোখে পড়ে কোথাও কোথাও। কিন্তু তার দু-পাশের ঘরবাড়িদের কোনো চিহ্ন বেঁচে নেই আর। ইস্পাত, কংক্রিট, প্লাস্টার, প্রাচীন ওকের সুদৃঢ় কাঠ... শেষমেশ কোনো কিছুই টিকে থাকতে পারেনি।

মৃত্যুর মুহূর্তটাতেও তারা একত্র মাথা তুলে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল... বিস্ফোরিত হতে-থাকা বোমাটার আলোয় নিষ্কম্প, নিশ্চল। আর তারপর, আগুন ধরে ধু ধু করে জ্বলে ওঠবার অবসরটুকু পাবার আগেই বিস্ফোরণের বিধ্বংসী তরঙ্গ এসে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে গেল তাদের। প্রেফ উবে গেল তারা। মাইলের পর মাইল জুড়ে জ্বলে-ওঠা ক্ষুধার্ত অগ্নিগোলক কৃষিভূমিদের বুক দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল দূরদূরান্তরে। আর তার ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে পাক খেয়ে-ওঠা একটা স্তম্ভ... সে ধ্বংসলীলার বহুকাল পরেও তা মানুষের স্মৃতিকে দুঃস্বপ্নের মতো পীড়িত করে চলবে... নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন, অপ্রয়োজনীয় দুঃস্বপ্ন